১৭

তারিখ 16 JUL ১৯৯৮
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

পথে প্রান্তরে

পথচারী

এর মধ্যে কয়েকদিনের জন্য দেশের বাড়ী গিয়েছিলাম। অনেকেই এই ঘোর বর্ষায় বাড়ী যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজন এমনই একটা জিনিস যেখানে নিষেধ মানা যায় না। যে ক'দিন বাড়ী ছিলাম দিনভর থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। তবে রাস্তাঘাট ভালো ছিল। তাই বের হতে তেমন অসুবিধা হয়নি। যেদিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু তার আগের দিন স্থানীয় শহীদ স্মৃতি কলেজের এক অধ্যাপক আমাকে পরীক্ষা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পিরোজপুর জেলার এই কলেজটি অল্প কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই স্বরূপকাঠি থানায় একটি সরকারী কলেজসহ আরো চারটি কলেজ থাকলেও এই উচ্চ মাধ্যমিক কলেজটিতে পড়া-শুনা হয় ভাল। শিক্ষকরা অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে পড়ান। গত বছর তার ফলও পাওয়া গেছে। একটি ছাত্র যশোর বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিল। সরকারী কলেজের ভাগ্যে এতদিনে যা জুটেনি তা জুটেছে এই নতুন কলেজটিতে। অনেককে বলতে শুনেছি, সরকারী কলেজটি সরকারী হবার পর শিক্ষকরা ঢিলা দিয়েছেন। সরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে এই ঢিলা দেয়াটা এখন একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে বললে ভুল হবে না। এটি ঘটছে দেশের সর্বত্র। শহীদ স্মৃতি কলেজে পরীক্ষা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে অবশ্য একটি কারণও ছিল। দু'জন শিক্ষক বলেছিলেন, গত বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলে তাঁরা উৎসাহিত হয়ে তাদের পেছনে এবার খুব খেটেছেন। এবারও তাঁরা ভাল ফলাফল আশা করেন। তাছাড়া আগামী শিক্ষা বছর থেকে কলেজটিতে স্নাতক ক্লাস শুরু করার কথা আছে। বৃষ্টির মধ্যে কলেজে গিয়ে পৌছার কিছুক্ষণ পর ইংরেজী প্রথম পত্রের পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। আমি যখন অধ্যক্ষ শাহ আলম সাহেবের কক্ষে বসে শিক্ষকদের সাথে আলাপ করছিলাম তখন একটি ছাত্র ইংরেজীর অধ্যাপকের সাথে সেখানে ঢুকলো। ছাত্রটি শিক্ষকের কাছ থেকে যাচাই করে নিচ্ছিল তার দেয়া উত্তর সঠিক হয়েছে কিনা। ইংরেজীর অধ্যাপক বললেন যে, তিনি বার-তের বছর যাবৎ অধ্যাপনা করছেন, এর মধ্যে এবারই প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে। তিনি আরো বললেন, যাদের ইংরেজীর উপর দখল নেই এবার তাদের খারাপ করার কথা।

প্রশ্নপত্রের ধারা যে পরিবর্তিত হয়েছে তা গত মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ই টের পাওয়া গিয়েছিল। প্রশ্ন ব্যাঙ্ক তুলে দেয়া এবং লিখিত ও নৈর্ব্যক্তিক অংশে পৃথকভাবে পাস করার বিধানটি ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ যাবৎকালের সর্বোত্তম পদক্ষেপ। চেনা-জানা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের দেখেছি অনেকদিন পর টেক্সট বুক, গাইড, সব পড়তে। প্রশ্ন ব্যাঙ্ক উঠে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের এখন টেক্সট বুক না পড়ে উপায় নেই। মেধা যাচাইয়ের এ ছিল একটি সঠিক পদক্ষেপ। কেউ কেউ বলেছেন, প্রশ্ন ব্যাঙ্ক তুলে দেবার ফলে পরীক্ষায় পাসের হারে তার প্রতিক্রিয়া হবে। হয়েছেও কিছু। তবে সর্বত্র নয়। যেমন রাজশাহী বোর্ডে গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের হার ছিল ৫০ দশমিক ৫৭। এবার সেখানে ৩৮ দশমিক ৮৬। আবার যশোর বোর্ডে গত বছর যেখানে ছিল ৪২ দশমিক ৬২। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৪৩ দশমিক ৯৯। সুতরাং প্রশ্ন ব্যাঙ্ক তুলে দেয়ায় পাসের হার কমেছে তা হলপ করে বলা যাবে না। তবে কমতো যদি প্রশ্ন ব্যাঙ্ক উঠে যাবার কথা শুনে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে পড়া-শুনা না করতো। সমস্যা সে জন্য ছাত্র-ছাত্রীর বেলায় নয়; শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের বেলায়। তারা সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে ছাত্র-ছাত্রীরা সে অনুযায়ী নিজেদের তৈরী করতে পারে। তার প্রমাণ এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে। হয়তো ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন ব্যবস্থায় ধাতস্থ হতে কিছু সময় লাগতে পারে এই যা।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এখনো চলছে। একই প্রশ্নপত্রে সকল বোর্ডের পরীক্ষা হচ্ছে। একই প্রশ্নপত্রে সকল বোর্ডের পরীক্ষার দাবীটি দীর্ঘদিনের। একই মাপকাঠিতে দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীর মেধা যাচাই আগেই হওয়া উচিত ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা পাস করে মার্কশীট দেখিয়ে চাকরি নেয়। সেজন্য মেধা যাচাইয়ের অভিন্ন মাপকাঠি প্রয়োজন। পাকিস্তান আমলের কথা মনে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রয়াত ডঃ মতিন চৌধুরী তখন জহুরুল হক হলের প্রভোষ্ট এবং ফিজিক্সের হেড। একবার ইসলামাবাদের একটি কনফারেন্স থেকে ফিরে এসে বললেন, পাকিস্তানে যে ছেলেরা ফার্স্ট ক্লাস পায় তারা ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের সেকেণ্ড ক্লাস ছাত্রদের সমতুল্যমানের। আমাদেরও পাকিস্তানের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্লার্স বাড়িয়ে দেয়া উচিত। তা নাহলে সব চাকরি ওখানকার ছেলে-মেয়েরা বাগিয়ে নেবে। একই দাবী অনেকদিন আগে থেকে শুনছি ঢাকা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। সত্য-মিথ্যা জানি না, তারা বলেছে, অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় ঢাকা বোর্ডে প্রশ্নপত্র কঠিন করা হয়। নকল করতে দেয়া হয় না। এসব দিক থেকে অন্যান্য বোর্ড উদার। এতে উচ্চ ক্লাসে ভর্তি ও চাকরি-বাকরি সবক্ষেত্রে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এসব অভিযোগের কথা ভাবলে পরীক্ষায় অভিন্ন প্রশ্নপত্র একটি সঠিক ও সঙ্গত পদক্ষেপ। এখন সারাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার সঠিক যাচাই সম্ভব হবে।

তবে ঢালাওভাবে স্কুল-কলেজ জাতীয়করণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা কতটা সঙ্গত ছিল তা ভেবে দেখা দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা সরকারী হওয়ার পর তাঁরা ভালোভাবে শেখানোর কাজটা বাদ দিয়েছেন। উপজেলা পদ্ধতি শুরুর পর স্কুলগুলো উপজেলা চেয়ারম্যানের তদারকিতে যাওয়ার পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। এখন আবার যা তা-ই। সরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও সরকারী কলেজের অবস্থা একই। তদারকি নেইতো পড়ানোতে ফাঁকি। দেশের দরিদ্র জনগণের টাকায় এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে কিনা বা চলা উচিত কিনা তা সরকারের চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে চলছে এক সীমাহীন নৈরাজ্য। শিক্ষকরা বেতন নেবেন স্কুল থেকে। কিন্তু তাঁদের মন পড়ে থাকবে ব্যাচে বা কোচিং-এ। স্কুলের বেতন এমনিতে পাওয়া যাবে। ব্যাচ, ও কোচিং-এরটা ধরতে হবে। তাঁরা স্কুলে আন্তরিকভাবে পড়ালে ও পরীক্ষা নিলে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাচে ও কোচিং-এ ছুটতে হত না পাগলের মত। স্কুলের রেজাল্ট আরো ভাল হত। সেদিন এক বন্ধু টেলিফোনে বললেন, মতিঝিলের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে বলেছেন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুল থেকে একজনও মেধা তালিকায় না আসায় শিক্ষকরা নাকি কেঁদেছেন। আসলে কথাটা ঠিক নয়। ওই স্কুলের পাশের মেয়েদের স্কুল থেকে স্ট্যাণ্ড করায় ছেলেদের স্কুলের শিক্ষকরা হয়তো কিছুটা লজ্জা পেয়েছেন। তাছাড়া ছেলেদের স্কুলের এবারের ব্যাচটা নাকি ভাল ছিল।

মফস্বলে স্কুল-কলেজগুলোর বিরুদ্ধে দু'টি বড় অভিযোগ। একটি ব্যাপক নকল, অন্যটি পরীক্ষার সময় সন্ত্রাস। সব স্কুল-কলেজে হয় তা বলা ঠিক হবে না। আমি এমন স্কুল-কলেজও দেখেছি যেখানে সন্ত্রাস নেই। নকলও কম। শিক্ষক-পরিদর্শকরাই কড়াকড়ি আরোপ করেন। নকল প্রবণতা সাধারণ ওই সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশী যারা ভাল পড়াশুনা করে না বা যাদের স্কুল বা কলেজে ভাল পড়ানো হয় না। সন্ত্রাসও ওদের বেলায় বেশী। তবে যেসব এলাকায় দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক নেতা আছে তাদের পোষ্য মাস্তানরা পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্ত্রাস করে। সেজন্য মনে হয়, সরকার সন্ত্রাস প্রশ্রয় না দিলে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ধীরে ধীরে স্থিরতা নেমে আসবে। কয়েকদিন আগে ঢাকা কলেজের সামনে একশ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রাস্তায় নেমে গাড়ী ভেঙ্গেছে। কর্তৃপক্ষ এদের কাছে নতি স্বীকার না করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিলে আমার ধারণা, আগামী বছর এ মাস্তানী হবে না। তবে এটা ঠিক, প্রশ্নপত্র যে পরীক্ষারই হোক, স্ট্যাণ্ডার্ড ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পাশ করার মত নম্বর পেতে পারে তার ব্যবস্থা প্রশ্নপত্রে থাকা উচিত। মেধাবী ছাত্রদের জন্য অন্য প্রশ্ন থাকবে, তা হলে ফার্ষ্ট ডিভিশন, সেকেণ্ড ডিভিশন কম হলেও পাসের হার কম হবে না। উপর থেকে চাপ না পড়লে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয় না তা এতদিনে বোঝা গেছে।